মানুষী কথা

দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৮

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

পেশাগত অসুস্থতা ও ক্ষতিপূরণ
নব দত্ত ৩

রবির আলোয় নারী
শ্রেয়া রায় ৬

খুন্তি—এক মুষল পর্ব
মালা ঘোষ ৯

ছোটগল্প
বাবু মুখোপাধ্যায় ১১

যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার
মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭

সম্পাদক ও প্রকাশক :
প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক : সুতপা দেব

সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষে :
কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, জয়ন্তী ভট্টাচার্য, শ্রাবণী সরকার নিয়োগী, কৃষ্ণা দাস, টিঙ্কু খান্না

মুদ্রণ : অপটিমা, ৪ নবীন পাল লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা ৭০০০৮৫ থেকে প্রকাশিত

বিনিময় ২৫ টাকা

সম্পাদকীয়

বম্বে হাইকোর্ট সম্প্রতি একটি আত্মহত্যার মামলার রায়ে বলেন স্ত্রীকে ভাল করে রাঁধতে বলা বা ঠিক মতো ঘরের কাজ করতে বলা মানসিক অত্যাচার নয়।

ঘটনাটি সতেরো বছর আগের। ১৯৯৮ সালে বিজয় শিন্ডে বিয়ে করেন। তিনি স্ত্রীকে সবসময় ঘরের কাজকর্ম, রান্না ঠিক মতো না করতে পারার জন্য বকাঝকা করতেন। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়িও যোগ দিতেন। যেদিনের ঘটনা সেদিন মেয়েটির দাদু এবং মামাতো ভাই এসেছিলেন তাদের বাড়ি। দাদু সব ঘটনারই সাক্ষী। তিনি ফিরে যাওয়ার পর নাতনির আত্মহত্যার খবর আসে। এফআইআর হয় মেয়েটির বাড়ির পক্ষে। অভিযোগ ছিল আত্মহত্যায় প্ররোচনার।

কিন্তু বিচারে বলা হয় রান্না বা বাড়ির কাজ ভাল করে করতে বলা মানসিক নির্যাতন নয়। এখন প্রশ্ন হল, একটি মেয়ের ভাল রান্না বা ঘরের কাজ করতে পারাই কি মেয়েটিকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি? আজ একুশ শতকেও সমাজ ও আইন যদি একটি মেয়েকে রান্নাঘরে বা বাড়ির কাজে আটকে রাখে, তাহলে সমাজ এগোল কোথায়? পুরুষের দায়িত্বের কথা এক্ষেত্রে অর্থাৎ অন্দরের কাজে অস্বীকার করার এটি একটি ইঙ্গিত। মেয়েটি শুধু স্বামী বা অন্যান্য অভিভাবকদের সাংসারিক কাজের আজ্ঞাবহ? এটিই তার একমাত্র জগৎ? তাই অন্দরের কাজে তাকে দায়ি করে বকাঝকা করলে আইনের চোখে তা অপরাধ নয়! স্বাভাবিক ঘটনা! এখনও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে হয়েই রইল!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচ্ছদ। সংগ্রহে শিবাদিত্য দাশগুপ্ত।

PEST CONTROL CORPORATION OF INDIA
PCCI

Kamalakanta Bhattacharjee

PEST CONTROL CORPORATION OF INDIA
GOVERNMENT ENLISTED CIVIL AND ELECTRICAL CONTRACTOR

Cleaning & Upkeepment Job ● Pest Control ● Security Service
House Keeping Job ● Gardening & All Kinds of Labour Supplier

P-288 C.I.T. Road, Scheme IV M, Kolkata -700 054, Phone : 89102 44483
E-mail : pcciindia2@gmail.com Phone : 89102 44483

পেশাগত অসুস্থতা ও ক্ষতিপূরণ

অ্যাসবেস্টস উৎপাদনের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের অসুস্থতা এবং তদের ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিয়ে লিখছেন **নব দত্ত**

অনেকদিন বাদে আবার ষষ্ঠীচরণের আড্ডায় এসেছি। কী ব্যাপার ষষ্ঠীচরণ? আজ আড্ডা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তা তোমাদের বন্ধুরা গেল কোথায়?

সবাই আসবে তবে দেরি করে। ওই তো কামাল চলে এসেছে। পার্বতীদি, সবিতারা আসবে বলে গেছে। শুনেছেন তো ভানুদা, বাংলায় প্রথম পার্বতীদি, সবিতাদিদের মিলিত চেষ্টায় গৃহ পরিচারিকাদের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে।

হ্যাঁ, শুনলাম। লড়াইয়ের একটা ধাপ পেরোল। ওদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আরে এই তো সব আমাদের লড়াকু মহিলা সাথীরা হাজির।

কী মনে করে দাদা। এমনিতে তো এদিক পানে আসেন না। নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কোনও খবর আছে।

হ্যাঁ গো পার্বতী। কদিন আগে এক রবিবার, পাহাড়পুর রোডে এভারেস্ট ইন্ড্রাস্ট্রির কাছে ওয়ার্কার্স ইনিশিয়েটিভের উদ্যোগে পেশাগত রোগে অসুস্থ এবং মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদানের জমায়েতে হাজির হয়েছিলাম। শ্রমিকনেতা বন্ধু কমল তেওয়ারির আহ্বানে উপস্থিত থেকে এক অনন্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম।

কলকাতার গার্ডেনরিচে পাহাড়পুর রোডে, 'এভারেস্ট' অ্যাসবেস্টস তৈরির কারখানা। এর বিদেশী মালিকানা হাত বদল হয় ১৯৮৮ সালে। এক বেলজিয়াম কোম্পানি কিনে নেয়। তারপরে আবার মালিকানার বদল ঘটে ২০০১ সালে, এসিসি অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েট সিমেন্ট-এর হাতে পরিচালনার ভার আসে, তবে সেটি বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ২০০৫ এভারেস্ট ইন্ড্রাস্ট্রিজ কিনে নেয় বর্তমান মালিকরা। অ্যাসবেস্টসের উৎপাদন শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল সহ ৬০টি দেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর উৎপাদন এবং ব্যবহার উভয়ই ক্ষতিকারক। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষ পেশাগত অসুস্থতায় মারা গেছে হোয়াইট অ্যাসবেস্টস থেকে।

আচ্ছা ভানুদা, এদের অসুস্থতার হদিশ কীভাবে পাওয়া গেল? আর ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থই বা কে দিল?

হ্যাঁ, খুবই ন্যায্য প্রশ্ন কালাম। দেখো দীর্ঘ শ্রমিক আন্দোলনে বাংলার কারখানায় বা কাজের জায়গায় সুরক্ষা ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়ে কোনও উদ্যোগ বা আন্দোলনই শ্রমিক ইউনিয়নগুলির তরফে হয়নি। ফলে এখানে বা দেশের অন্যত্র বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশের কায়মূর, মহারাষ্ট্রের বুলন্দে শ্রমিকদের পেশাগত রোগ নির্ণয় এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার গোটা আন্দোলনে বা সংগ্রামে বিভিন্নভাবে কিছু শ্রমিক উদ্যোগের কথা জানলেও মুখ্য ভূমিকা আইনজীবি কে. কে. মুখার্জি এবং ডাঃ মুরলীর। তাঁদের সক্রিয় নিরলস প্রচেষ্টায় হাজার জন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, আরও ছয়শো জন ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রচেষ্টায় যুক্ত আছেন।

সেদিন সভায় পাহাড়পুরের শ্রমিকনেতা কমল বলছিলেন, 'মজদুর মেহনত বেচতে আসে, জিন্দেগী বেচতে আসে না।' খুবই সোজাসুজি কথা। এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিকদের মধ্যে এঁদের কোনও ইউনিয়ন এতদিন ছিল না।অথচ এঁদের উদ্যোগ-সক্রিয়তা সর্বাধিক। যাঁদের ইউনিয়ন ছিল তাঁরা এসবে নেই। এই ছবিটা বাংলার সর্বত্র। বর্তমান শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে বলছিলেন এভারেস্ট কারখানার শ্রমিক গৌতম সর্দার, অরুণ চক্রবর্তী।

সেদিন সভায় পাহাড়পুরে শ্রমিকনেতা কমল বলছিলেন, 'মজদুর মেহনত বেচতে আসে, জিন্দেগী বেচতে আসে না।'

যাঁরা ১৯৮৮ সালের আগে কর্মরত শ্রমিকদের মেডিকেল ক্যাম্পগুলো করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বর্তমান ম্যানেজমেন্ট এঁদের এই মানবিক উদ্যোগকে ভাল চোখে দেখে নি। এঁদের সাসপেন্ড করেছে।

২০০৯ সালে আইনজীবি কে. কে. মুখার্জী এক গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারেন এভারেস্টের পূর্বতন বিদেশী ব্রিটিশ মালিকানা সংস্থাটি ১৯৮৮ সালে দেউলিয়া হয়ে যায়। এই শিল্প গ্রুপটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশের জন্য অনেকগুলি আলাদা আলাদা ট্রাস্ট বানিয়েছিল। ২০০৪ সালে ডাঃ মুরলী বোম্বের এভারেস্টের বুলন্দে একচল্লিশ জন শ্রমিককে পেশাগত রোগে আক্রান্ত হিসেবে নির্ণয় করেন। শুরু হয় ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লড়াই যা আজও চলছে। এভারেস্টের ১৯৮৮ পর্যন্ত মালিক ছিল টার্নার ম্যানুয়াল গ্রুপ। এদের নিয়োজিত একদল ডাক্তার ভারতে অ্যাসবেস্টসিস আক্রান্ত শ্রমিকদের নস্যাৎ করে। ডাক্তার মুরলী লন্ডনে, হল্যান্ডে ডাক্তারদের মুখোমুখি হয়ে প্রমাণ করেন যে তাঁর পেশাগত রোগ নির্ণয়ে কোনও ভুল নেই। অবশেষে তাঁরা মেনে নেন। বর্তমানে লন্ডনে বসবাস করেন আইনজীবি কে কে মুখার্জির পক্ষে আইনি লড়াই শুরু হয়। এরই ফলস্বরূপ, দেশে প্রায় হাজারজন অ্যাসবেসটসিস' আক্রান্ত শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। এই সময়ে মধ্যপ্রদেশের কায়মূর বা কোয়েম্বাটুর মেডিকেল ক্যাম্প চলছে। কলকাতায় এভারেস্টে ১৯৮৮ পর্যন্ত কাজ করেছেন অ্যাসবেসটসিস আক্রান্ত মৃত ও অসুস্থ শ্রমিক ১১৫ জন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। ৮ জুলাই ২০১৮, পঁয়ত্রিশ জন আটলাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পেলেন।

ষষ্ঠীচরণ প্রশ্ন করল, আচ্ছা ভানুদা, যাঁরা ক্ষতিপূরণ পেলেন সবাই কী পুরুষ। কারখানায় কী শুধু পুরুষ শ্রমিকই কাজ করতেন?

হ্যাঁ, কোনও নারী শ্রমিক কাজ করতেন না। অথচ অসুস্থতা নারীদের মধ্যে ব্যাপক দেখা যাচ্ছে। এখন যে মেডিকেল ক্যাম্প হচ্ছে সেখানে একশত তিরিশ জনের মধ্যে আশিজন নারী অ্যাসবেসটসিসে অর্থাৎ ফুসফুসজনিত অসুস্থতা বা শ্বাসকষ্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত। বম্বেতে পেভেরকারে আটচল্লিশ জনকে পাওয়া গেছে যাঁদের বাবারা কাজ করতেন। কলকাতায় ক্ষতিপূরণের চেক বন্টনের সময় উপস্থিত থেকে দেখছিলাম, কয়েকজন নারী ক্ষতিপূরণ পেলেন, যাঁরা নিজেরা কারখানায় কাজ না করলেও অসুস্থ হয়েছেন। জানা গেল এঁদের বাড়িগুলি ছিল ফ্যাক্টরির পাশে। অ্যাসবেসটসের ধুলো দিনে তিন-চার বার ঝাড়ু দিত। স্বামী কাজ থেকে ফিরলে জামা ঝাড়ত বা কাচত। এরই ফলশ্রুতিতে এরা সব আক্রান্ত এবং মেডিকেল ক্যাম্পের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এদের খুব বেশি মাত্রায় 'এক্সপোজার' হয়েছে।

> আমাদের ফ্যাক্টরি আইন সহ একাধিক শ্রমআইন আছে যেখানে পেশাগত অসুস্থতা এবং ক্ষতিপূরণের কথা বলা আছে। কর্মক্ষেত্রে এইসব অসুস্থতা থেকে শ্রমিক কর্মীর প্রতিরোধক হিসেবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থা রয়েছে অথচ দুঃখের বিষয়, শ্রমিক সংগঠনগুলি এবিষয় নিয়ে কোনও কথা বলে না।

কলকাতা হাইকোর্টে এক জনস্বার্থ মামলায় পূর্বতন প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, হাইকোর্টে সমস্ত অ্যাসবেসটসের ব্যবহার বন্ধ করতে।

কালাম, পার্বতী, সবিতা এরা প্রায় সমস্বরে বলল, আচ্ছা ভানুদা, আপনি যা বললেন তাতে তো মনে হয় সব পেশাতেই এই পেশাগত অসুস্থতার ব্যাপারটা রয়েছে। তাহলে আমাদেরও তো বলা উচিত।

অবশ্যই সব ধরনের পেশাতেই এই বিষয়টা রয়েছে। সেই জন্যই তো আমাদের ফ্যাক্টরি আইন সহ একাধিক শ্রমআইন আছে যেখানে

পেশাগত অসুস্থতা এবং ক্ষতিপূরণের কথা বলা আছে। কর্মক্ষেত্রে এইসব অসুস্থতা থেকে শ্রমিক কর্মীর প্রতিরোধক হিসেবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থা রয়েছে অথচ দুঃখের বিষয়, শ্রমিক সংগঠনগুলি এবিষয় নিয়ে কোনও কথা বলে না। ১৯৮৮ সালের পরবর্তীতে যারা এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন তাদের নিয়ে কোনও মেডিকেল ক্যাম্প করা যায়নি। কারখানায় বর্তমান যে ইউনিয়ন রয়েছে তাঁদের তরফে কোনও উদ্যোগ নেই।

অ্যাসবেসটসের মতো ভয়াবহ জিনিসের ব্যবহার বা উৎপাদন একাধিক দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে অথচ বাংলা তথা ভারতে এবিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেই।

মানব সভ্যতার তথাকথিত দ্রুত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের চাহিদার পরিবর্তন। ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার ও বাজার বেড়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনেক গুণ বেশি হারে। দেখা দিয়েছে শিল্পের ধরনে পরিবর্তন, শিল্প ব্যবস্থার পরিবর্তন, শিল্পে ব্যবহার করা যন্ত্রের ও কাঁচামালের পরিবর্তন। এসেছে নতুন নতুন আবিষ্কৃত প্রযুক্তি। এনেছে নতুন বর্জ্য। নতুন না দেখা, না জানা বিপদ এসেছে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশে। আবিষ্কার হয়েছে নতুন ঘরানার পেশাগত রোগ।

১৮৯৫ সালে এক্সরে আবিষ্কার হবার প্রায় কুড়ি বছর পর থেকে এ সংক্রান্ত কারিগরদের মৃত্যুর খবর আসতে থাকে। অ্যাসবেসটস সৃষ্ট রোগ অ্যাসবেসটোসিস আবিষ্কৃত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে। ১৯৭৪ সালে প্রমাণিত হয় যে ভিনাইল ক্লোরাইড মোনোমোর-এর পলিমারইজেশন নিয়ে কাজ করেন এমন শ্রমিকদের যকৃতে এক ধরনের ক্যান্সার হয়।

মানব সভ্যতার তথাকথিত দ্রুত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের চাহিদার পরিবর্তন। ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার ও বাজার বেড়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনেক গুণ বেশি হারে। দেখা দিয়েছে শিল্পের ধরনে পরিবর্তন, শিল্প ব্যবস্থার পরিবর্তন, শিল্পে ব্যবহার করা যন্ত্রের ও কাঁচামালের পরিবর্তন। এসেছে নতুন নতুন আবিষ্কৃত প্রযুক্তি। এনেছে নতুন বর্জ্য। নতুন না দেখা, না জানা বিপদ এসেছে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশে। আবিষ্কার হয়েছে নতুন ঘরানার পেশাগত রোগ। ১৮৯৫ সালে এক্সরে আবিষ্কার হবার প্রায় কুড়ি বছর পর থেকে এ সংক্রান্ত কারিগরদের মৃত্যুর খবর আসতে থাকে। অ্যাসবেসটস সৃষ্ট রোগ অ্যাসবেসটোসিস আবিষ্কৃত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে। ১৯৭৪ সালে প্রমাণিত হয় যে ভিনাইল ক্লোরাইড মোনোমোর-এর পলিমারইজেশন নিয়ে কাজ করেন এমন শ্রমিকদের যকৃতে এক ধরনের ক্যান্সার হয়।

...

অ্যাসবেসটস—ফুসফুসের ক্যান্সার এবং মেসেথেলিওমা নিউমোকোনিওসিস (অ্যাসবেসটোসিস)।

অ্যাসবেসটস— ফুসফুসের ক্যান্সার এবং মেসেথেলিওমা নিউমোকোনিওসিস (অ্যাসবেসটোসিস)।

রবির আলোয় নারী

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নারী চরিত্রের বিবর্তন নিয়ে লিখেছেন **শ্রেয়া রায়**

দুই ধরনের বন্দীত্ব ছিল আমাদের সমাজের মেয়েদের---একদিকে তারা ছিল অন্তঃপুরে বন্দী, অন্যদিকে সমাজ-নির্দিষ্ট ভূমিকাতেও তাদের স্বাধীন সত্তা ছিল শৃঙ্খলিত। অন্তঃপুরের বন্দীত্ব একদিন আলগা হয়ে এল, কিন্তু ভূমিকার বন্দীত্ব বিষয়ে মেয়েরা ততটা সচেতন ছিল না অনেকদিন। রবীন্দ্রসাহিত্যের মাধ্যমেই বাঙালি মেয়েরা তাদের ব্যক্তিস্বরূপকে বুঝে নিতে শিখেছিল। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে বাঙালি মেয়েদের যাপনচিত্রেও অনেকটাই বদল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক—সবেতেই ধরা পড়েছে সেই বদল। তার সব পরিচয়টুকু তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন অনেকটা পরিসর। কিন্তু এখানে তাঁর চারটি উপন্যাস পর্যালোচনার মাধ্যমে বাঙালি নারীর বিবর্তনের একটি রেখাচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রথমেই যা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, তা হল রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস ও গল্পে যে নারী-পুরুষের কথা বলেছেন তারা সেকালের নর-নারী নয়, একালের নারী-পুরুষ। নতুন ভাবনা, নতুন চিন্তার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ তাদের নির্মাণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে পুরুষতন্ত্রের কাছে নারীকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের নারী-চরিত্রগুলো সেখানে আত্মপ্রত্যয়, আত্ম-গরিমায় উজ্জ্বল।

‘চোখের বালি’তে মনোবিশ্লেষণে বৈপ্লবিক নতুনত্ব সঞ্চার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বালবিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্খার জাগরণ এবং তার মানসিক পরিবর্তনের টানাপোড়েন এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বন্ধুত্ব পাতানোর ক্ষেত্রে বিনোদিনী যে নতুন ধারণা নিয়ে আসে, তাও রবীন্দ্রসৃষ্ট নারীর এক নতুন বৈশিষ্ট্য। ‘গঙ্গাজল’, ‘বকুলফুল’—এই সকল প্রচলিত পবিত্র ধারনা ভেঙে দিয়ে বিনোদিনী ‘চোখের বালি’ এই ধারনার মধ্যে বন্ধুত্বের নতুন দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ এক ভাবের সঞ্চার করে, যা তৎকালীন সময়ে একদমই নতুন বিনির্মাণ। তাই নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বাঙালি নারীর চরিত্র রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। বিনোদিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর অবদমিত কামবাসনা আর প্রেমের চেতনার প্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি নিজের পছন্দের পুরুষকে পুরোপুরি জয় করার ভাবনাও ধরা পড়েছে। এই নারী, কোনও সন্দেহ নেই একেবারে নতুন কালের আত্মপ্রত্যয়ী নারী। এইরকম নারীর বিপরীতে বরং মহেন্দ্র আর বিহারীকে নিষ্প্রভ মনে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী এই বিনোদিনীর পরিণাম রচনা করতে গিয়ে প্রাচ্যদেশীয় ঐতিহ্যটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে বিস্মৃত হননি। বিনোদিনীও পরিণামে মহেন্দ্র আর বিহারীকে অস্বীকার করে একক জীবন বেছে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। উপন্যাসের শেষে বিনোদিনী তাই বলে, ‘...আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত

বিনোদিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর অবদমিত কামবাসনা আর প্রেমের চেতনার প্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি নিজের পছন্দের পুরুষকে পুরোপুরি জয় করার ভাবনাও ধরা পড়েছে

সমাজের কাছে আমি তোমাকে লজ্জিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না। ... তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন, আজও তুমি তাই থাকো, আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।' মহেন্দ্র তাই ফিরে গেল আশার কাছে। বিহারী একাকী হল। জীবনের উত্তাপহীন সংযম নারী হিসেবে বিনোদিনীকে সমাহিত করল যেন। আমরা পেলাম রবীন্দ্রসাহিত্যে অনন্য এক নারীর দেখা।

রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি জিজ্ঞাসাই ছিল যে, সমাজ বিশেষ করে সংসারে স্বামী যদি নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় জীবনাচরণের ক্ষেত্রে, সেই অধিকার বহন করার জন্য নারী কতখানি প্রস্তুত। কারণ মেনে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়ার চাইতেও অনেক কঠিন কাজ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নিজস্বতা বজায় রেখে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা। এই জিজ্ঞাসা থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সৃষ্টি। নিখিলেশের শান্ত সংযত জীবনাদর্শ এবং বিমলার নিরুদ্বিগ্ন পতিব্রত হঠাৎ বাধা পেল পরিচিত সন্দীপের আবির্ভাবের ফলে। লোলুপ, উদ্ধত, অবিনয়ী, আবেগ-উন্মত্ত সন্দীপ দেশ সেবকের ছদ্মবেশে বিমলার শান্ত প্রসন্ন মনটিকেও উত্তেজিত করে তুলল। সন্দীপের প্রচন্ড আবেগের মত্ততায় বিমলাও কিছুটা স্খলিত হয়ে পড়ে। সন্দীপ 'বন্দে মাতরম' বলে বিমলার মন ভোলাতে চাইলেও আসলে সে নারীরূপকেই লালসার দৃষ্টিতে বন্দনা করেছে। শেষ পর্যন্ত নিখিলেশের ধৈর্য ও মহানুভবতায় বিমলা নিজের আবিল অবস্থাকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে উদার বিশ্বের বৃহত্তর পটভূমিকায় আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, ঘরের বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগৎও তাকে আপন করে নেয়। রবীন্দ্রনাথের বিমলা চরিত্রে আধুনিক নারীর ভাবনা আমরা খুঁজে পাই, '...পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রী পূজা দাবি করে। তাতে পূজারী ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।' বাঙালি নারীর আদর্শ রূপও ধরে রাখতে চেয়েছিলেন বিমলার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ। বাইরের জগতে বিমলা প্রতিষ্ঠা পেলেও, ঘরের বন্ধন যে আরও সত্য 'জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই যে উষাসতীর দান দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু কি সে নষ্ট হবার?' বিমলা ফিরে আসে নিখিলেশের কাছে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুদিনী ও মধুসূদনের বিড়ম্বিত দাম্পত্য, জীবনের অশান্তি এবং তার পরিণাম পটভূমি হিসেবে উঠে এসেছে। কুমুর সৌন্দর্য, শুদ্ধতা, তেজস্বিতা আমাদের যেমন মুগ্ধ করে, তেমনি আর্থিক বিপর্যয়ে ক্রমাগত তলিয়ে যাওয়া দাদার সংসারে উনিশ বছরের কুমারী কন্যার অবস্থান কতটা নড়বড়ে সে উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথ উন্মোচন করেছেন, কুমুর এক ধরনের অপরাধবোধে পীড়িত ভাবনা থেকে। কুমু চরিত্র কেবল সনাতন নারীর নয়, তার মধ্যে যুগপৎ আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী নারীর চেতনাও বিদ্যমান। দাদা বিপ্রদাসের নিয়ত সাহচর্যে গড়ে উঠেছিল তার শিক্ষা, রুচি ও মূল্যবোধ। 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলার কাহিনি' তার মনে যেমন সতীত্বের এক আদর্শলোক তৈরি করেছিল, তেমনি গড়ে তুলেছিল আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা। মধুসূদন কুমুকে বিষয় সম্পত্তির মতো নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সংকীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বন্ধ করতে চেয়েছিল বলেই কুমু প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এখানেই কুমু চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য। কুমুকে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছিলেন তাঁর সবটুকু রোমান্টিক পক্ষপাতিত্ব দিয়ে। তবে পুরুষতন্ত্রের কাছেই পরাজয় ঘটে

মধুসূদন কুমুকে বিষয় সম্পত্তির মতো নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সংকীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বন্ধ করতে চেয়েছিল বলেই কুমু প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এখানেই কুমু চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য।

কুমুর। বিশেষ করে মাতৃত্বের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। যদিও স্বামীগৃহে ফিরে যাওয়ার সময় সে বলে, 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোয়ানো যায় না।' তাহলে মাতৃত্বের ভূমিকা পালনকেই রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের চূড়ান্ত সার্থকতা বলে মনে করেন নি। কুমুদিনীর সেই 'এমন কিছু' তো তার আত্মস্বরূপ। তারই বোধ থেকে কুমু বলতে পারে, 'আমি ওদের বড়ো বউ, তার কী কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই।' আজকের দিনের মেয়েরা, আমরাও তো ভূমিকার বেড়া ভেঙে আত্মস্বরূপেরই সন্ধানী আর রবীন্দ্রনাথের থেকেই পাওয়া সেই চেতনা।

রবীন্দ্রনাথের রোমাঞ্চ-আশ্রিত উপন্যাস 'শেষের কবিতা' অমিত ও লাবণ্যের প্রেমের আখ্যান, এই কাহিনির প্রধান উপাদান। এই উপন্যাসেই চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল নায়িকা—লাবণ্য। অমিত রায়ের সাথে প্রেমের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতিতে বিবাহপর্বে প্রবেশের ঠিক পূর্বেই একদিকে কেটি মিটারের আবির্ভাব, অন্যদিকে শোভনলালের। পরিণামে লাবণ্য-শোভনলাল ও অমিত-কেতকীর পুনর্মিলন। অভিজ্ঞতা ও বেদনাময় চৈতন্যজাগ্রত লাবণ্য তার প্রেমের চিরন্তনতা, সজীবতা, স্বতঃস্ফূর্ততাকে চিরঞ্জীব করে রাখার জন্য অমিতের বিবাহ প্রস্তাবকে অস্বীকার করে। কারণ সে জানে সংসারে সংকীর্ণ পরিসরে চিরদিনের সপ্তপদী গমন অসম্ভব। জীবনের ঝোড়ো পথ অতিক্রম করে লাবণ্য জীবনের অর্থকে এইভাবেই বোঝে। তৎকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এই লাবণ্য রোমান্টিকতা-অভিসারী যে কোনও পুরুষের স্বপ্নে পরিণত হয়েছে—যার ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের প্রাগ্রসর ভাবনার এই নারী শোভনলালের সংসারের শত বন্ধন একদিকে রেখে, অমিতের প্রেমের মুক্তসাগরে অবগাহন করে বলতে পারে,

'তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্য্যবান।
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।'

'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনী উচ্চশিক্ষিতা, কিন্তু বাড়িতে লেখাপড়া করে। আর 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য উপার্জনশীল স্বাধীন নারী। এই দুটি উপন্যাস প্রায় একই সময়ে রচিত হলেও কুমুদিনী থেকে লাবণ্য বাঙালি মেয়ের অগ্রগতির ছবি। 'শেষের কবিতা'য় নর-নারীর প্রেমের অন্য একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে—মননের মিলনের দিক। 'ঘরে বাইরে'তে নিখিলেশ তার স্ত্রীকে পাঠ দিয়েছে, বিমলা শিখেছেও বিস্তর, কিন্তু নিখিলেশের সাথে তার মনের আদান-প্রদান হয়নি। আর অন্যদিকে মনের সংযোগ অসম্ভব ছিল 'যোগাযোগ'-এর মধুসূদন আর কুমুদিনীর। 'চোখের বালি' থেকে 'শেষের কবিতা'-এর মধ্যে নিহিত আছে মেয়েদের মানসলোকের বিবর্তনেরও ইতিহাস। রবীন্দ্র-উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলি আধুনিক, যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল অথচ গৃহী চেতনালব্ধ। এরাই আবার শুভ মূল্যবোধকে ধারণ করে কল্যাণী আর স্নেহময়ী। নারীর অধিকার, মাতৃত্বে এরাই অনন্য, সেই সঙ্গে আত্মস্বাতন্ত্র্যের চারিত্র্যেও প্রাগ্রসর আর চিরনতুন এবং একবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পটভূমিতে তারা একইভাবে প্রাসঙ্গিক।

তৎকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এই লাবণ্য রোমান্টিকতা-অভিসারী যে কোনও পুরুষের স্বপ্নে পরিণত হয়েছে—যার ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান।

খুন্তি—এক মুষল পর্ব

ঝাড়খন্ডের মর্মান্তিক গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে কলম ধরলেন **মালা ঘোষ**

গণ-মাধ্যমের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে ধামাচাপা পড়ে রইল পাঁচটি অসহায় মেয়ের গণধর্ষণের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা।

ঝাড়খন্ডের রাঁচির কাছেই একটি ছোট্ট শহর 'খুন্তি'। তারই কাছে কোচাং নামের গ্রামে একটি মিশনারী স্কুল চালান ফাদার অ্যালফানসো অ্যান্ড্রু। কোচাং-এর কাছেই পাথথলগড়ি এলাকা, যা আদিবাসী অধ্যুষিত। তারা পাথথলগড়িতে নিজেদের স্বায়ত্তশাসন কায়েম করেছে। তারা পাহাড়ের খাদান থেকে পাথর তুলে বিভিন্ন জায়গায় পাঠায়। এইরকম লাভজনক কাজে অবশ্যই জড়িত আছে কিছু অসাধু মুনাফাখোর বন্দুকবাজ। সরল আদিবাসীদের কাজে সাহায্য করার নামে তারা এর দখল নিচ্ছে। এই অঞ্চলে নারীপাচার প্রতিনিয়ত ঘটে থাকে।

মিশনারী স্কুলের মাধ্যমে আমন্ত্রিত একটি এন.জি.ও থেকে পাঁচটি মেয়ে ও কয়েকজন পুরুষ সেখানে যায় নারীপাচার সম্পর্কে স্থানীয় মানুষজনদের সচেতন করার জন্য। এই উদ্দেশ্যে তারা ১৯ জুন একটি পথনাটিকা পরিবেশন করে। নাটকটি চলাকালীনই সেখানে উপস্থিত হয় বন্দুকবাজের দল। তারা পুরুষদের মারধোর করে, মেয়েদের পাঁচজনকে বাইকে করে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে। পরদিন মেয়ে পাঁচজন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ফিরে আসে ও তারা সেই স্থান পরিত্যাগ করে। প্রশাসনের চাপে তারা কোথাও কিছু জানায় না।

মিশনারী স্কুলের, আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর মুখোশের আড়ালে ধর্মান্তরকরণ করাটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

কয়েকদিন পর দৈনিক জাগরণ পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানান হয়। যদিও পুলিশ আগে কিছু জানত না, তা নয়। ঝাড়খন্ডের এই মর্মান্তিক গণধর্ষণের কান্ডে জাতীয় মহিলা কমিশন গত ২২ জুন একটি তিন সদস্যের দল গঠন করে ও খুন্তিতে পাঠায়। তিন সদস্যের দলটি সম্পূর্ণ বিষয়টির ওপর তদন্ত করে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, এই ভয়াবহ ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে প্রাক্-পরিকল্পিত এবং খুব সুচারুভাবে সংঘটিত হয়েছে। রিপোর্টে এও বলা হয় যে 'আরশি মিশন' স্কুল থেকে নারীদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই মিশনের ফাদার অ্যালফানসো অ্যান্ড্রুর আচরণের ব্যাপারে গুরুতর সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাঁর আমন্ত্রণে দলটি সেখানে গেলেও তিনি এই নাট্যদলের সদস্যদের অপহরণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। জাতীয় মহিলা কমিশনের দলটি অতঃপর জেলা কালেক্টর, পুলিশ সুপার, রাজ্য মহিলা কমিশন, ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপ-বিভাগীয় পুলিশ অফিসারদের রিপোর্ট দেখান এবং সকলেই ফাদার অ্যালফানসোর ভূমিকায় গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেন। পরের বৃহস্পতিবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ডেকে পাঠান হয়। এছাড়া ওইদিনই ঝাড়খন্ড জেলার এই নারকীয় গণধর্ষণের ঘটনায় জড়িত সন্দেহভাজনদের বিষয়ে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়। ফাদার ও তৎসহ স্কুলের বসবাসকারী মানুষদের বিরুদ্ধেও একটি মামলা দায়ের হয়। পরে ফাদার ব্যক্তিগত বন্ডে মুক্তি পান।

এইরকম লাভজনক কাজে অবশ্যই জড়িত আছে কিছু অসাধু মুনাফাখোর বন্দুকবাজ। সরল আদিবাসীদের কাজে সাহায্য করার নামে তারা এর দখল নিচ্ছে।

খুন্তির পুলিশ অফিসার অশ্বিনী কুমার সিনহা বলেন, পুলিশ পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য তাদের স্কেচ এঁকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

পাথথলগড়ি আন্দোলন, যা আদিবাসীদের নিজস্ব অধিকার আদায়ের আন্দোলন আজ তা কিছু মাফিয়া দ্বারা কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। ফলাফল এখনও জানা যায়নি। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই সরল মানুষদের উপরেই আসবে চরম শাস্তি, এটাই স্বাভাবিক।

সাম্প্রতিক খবরে জানা যাচ্ছে এই পরিকল্পনার প্রধান ছিলেন জুনাস টুডু। জুনাস টুডু ও বলরাম সামাদকে চক্রধরপুর রেলস্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জুনাস মাওবাদী 'পিপলস্ লিবারেশন ফ্রন্ট'-এর সদস্যদের প্ররোচিত করেছিল এই কাজটি করার জন্য। (পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল নবীন কুমারের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী)।

পুলিশ এই পিপলস্ লিবারেশন ফ্রন্ট-এর সদস্যদের ও ফাদার অ্যালফানসো অ্যান্ড্রুকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ বলছে, সামাদ এই ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন ও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী খুন্তির জঙ্গল থেকে পাঁচটি রাইফেল পাওয়া গেছে।

দেখা যাচ্ছে যে, যাদের নাম পাওয়া যাচ্ছে, তারা সকলেই আদিবাসী। এ ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ স্বাধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করা আদিবাসীরা খুব সহজেই এই ধরনের মামলার শিকার হন। সামাজিক অবস্থানের দিকে তাকিয়ে তাঁদের বহুভাবে নিপীড়ন করা চলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সোচ্চার হতে পারি কী নিরপেক্ষ বিচার চেয়ে?

খুন্তির পুলিশ অফিসার অশ্বিনী কুমার সিনহা বলেন, পুলিশ পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য তাদের স্কেচ এঁকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

ত্রুটি স্বীকার

অগস্ট ২০১৮, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ ছিল কামরুল হাসানের। ভুলবশত জয়নুল আবেদিনের নাম প্রকাশিত হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

ছোটগল্প

তাম্রলিপ্তের সন্ধানে

বাবু মুখোপাধ্যায়

(দৃশ্যপট-আমেরিকার গ্রান্ড ক্যানিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়ান গবেষিকা ছাত্রী রেণি লিউইস, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বাঙালি ছাত্র সম্বরণ, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকা ছাত্রী (অন্যলিঙ্গ) চন্দ্রকণার একটি বিশেষ উদ্যোগ। উদ্যোগভূমি-পূর্ব মেদিনীপুরের বিচিত্র ও অপূর্ব সুন্দর নদ-নদী, সমুদ্র সংলগ্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য নন্দিত পাঁচমাথা খেজুর গ্রাম। গ্রামের বাঙালি ছেলে তমাল ও দিল্লির হিন্দীভাষী মেয়ে তামসী এদের সহযোগী। বিদ্যাব্রহ্ম বাবু সর্বাধিসর্বা। মনোরঞ্জনবাবু বিশেষজ্ঞ। প্রায় হাজার বছর ধরে এখানে ভূগর্ভে শায়িত একটি বাণিজ্য তরী ''বঙ্গাভারতী তাম্রলিপ্ত'' অবশেষে আজ উত্থিত হবে।)

পাঁচমাথা খেজুর গাছটার নীচে জড়ো হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। কোদাল গাঁইতা ঝুড়ি বেলচা নিয়ে একশজনের অগ্রগণ্য দলটি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে জমায়েতের কেন্দ্রবিন্দুতে। রেণি লিউইস, চন্দ্রকণা আর সম্বরণ নেতৃত্ব দিচ্ছে সামনে থেকে, তমাল আর তামসী সহযোগী। বিদ্যাব্রহ্ম বাবু ও মনোরঞ্জনবাবু সবার মাথার উপর। প্রত্নতাত্ত্বিক 'রিমোট সেন্সিং' পর্যবেক্ষকদের কপ্টারটা চক্কর দিচ্ছে আকাশে। শান্তি রক্ষকরা ভিড় সামলাচ্ছে।

রেণির বাড়ি আমেরিকার অ্যারাইজোনা প্রদেশের গ্রান্ড ক্যানিওনের সুপাই-তে। এরা হাভাসুপাই উপজাতির। আমেরিকান ইন্ডিয়ান বা আমেরিকার আদিবাসী এরা। আজ থেকে মাত্র আড়াইশ বছর আগে, এরা ইওরোপিয়ানদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। তখন এদের সংখ্যা সাড়ে তিনশরও কম। এখন দ্বিগুণের কিছু বেশি। তারপর গ্রান্ড ক্যানিওন রেল লাইন ও ন্যাশনাল পার্ক তৈরির সময় ও তারওপরে, ১৮৮২ থেকে ১৯৭৫ প্রায় এক শতাব্দী ধরে নিজেদের জায়গা থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কঠিন গণতান্ত্রিক লড়াই চালিয়েছে এখানকার মানুষরা। রেণি তাদেরই উত্তরসূরী। রেণি গ্রান্ড ক্যানিওনের হাভাসুপাই রিজার্ভেসনের এ-কালের মেয়ে। তার মনে আছে ছোটবেলায় বাবা-মা তাকে ডাকতো ''হালা পকরি'' নামে। মানে, চাঁদ বুড়ি। ছোট থেকেই বোর্ডিং স্কুলে লেখাপড়া। মা-বাবাকেও হারিয়েছে ছোটতেই। বরাবর বাইরে বাইরেই থেকেছে। তবে জন্মস্থানটিকে ভোলেনি। এখন সে চব্বিশে পা দিয়েছে। গ্রান্ড ক্যানিয়ান ইউনিভার্সিটির সমাজ বিজ্ঞানের গবেষিকা। প্রাচীন সভ্যতা ও জনজীবনের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা ও জনজীবনের উপর তুলনামূলক আলোকপাতের গবেষণা করছে। এদেশে এসেছে তাম্রলিপ্তের সমাজ জীবনের উপর গবেষণা করতে। সঙ্গে পেয়েছে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বরণ মাইতি-কে আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চন্দ্রকণাকে।

চন্দ্রকণা আর সম্বরণ। চন্দ্রকণা অন্য লিঙ্গের মানুষ। দু জনই দু-জনকে খুব ভালোবাসে। দু জনেরই বাড়িতে প্রথম প্রথম খুব অমত ছিল। ওরা খুব বুঝিয়েছিল—পরে সবাই বুঝেছে, এটা অন্যরকমের ভালোবাসা। এ

ভালোবাসার রূপ রঙ রস অনন্য সুন্দর মোহময় প্রাকৃতিক ও পবিত্র। এ ভালোবাসা কেবলমাত্র সম্বরণ ও চন্দ্রকণার ভালোবাসা। সবাই মেনে নিয়েছে। দুই বাড়ির সবাই দু-জনকে ভীষণভাবে ভালোবাসে। চন্দ্রকণা-আর পাঁচ জনের মতোই স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। বাড়ি পাশের গ্রামে। লোকসমাজে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সে ছাত্রী হিসেবেই পরিচিত। সমাজে এদের মত মানুষকে হিজড়ে ব'লে কিছু মানুষ যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে থাকে এখানে ওকে কেউ এমন করেনা। সদাহাস্যময়ী, মিশুকে বুদ্ধিমতী চন্দ্রকণা এখানে সবার ভারি আদরের। প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের ছাত্রী সে। সম্বরণ বঙ্গোপসাগরীর বঙ্গভূমির ভূগোলের গবেষক। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে বাড়ি। সব সময় হাসি মুখ, মিশুকে ও সবার কথা ভাবে। সবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খুব মেধাবীও। রেণি কলকাতা ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করে খোঁজ পেয়েছে এই অসাধারণ দুই বন্ধুর। দ্বিফলা ভালোবাসায় আর একটি ফলা যুক্ত হল, বন্ধু হিসেবে রেণিকে পাওয়া।

হিসেব মত সময় হয়ে গেছে। তাম্রলিপ্ত যুগের প্রাচীন শঙ্খটার মুখে প্রথম ফুঁ দিলেন বিদ্যাব্রহ্ম বাবু। পঞ্চগ্রামের সম্মিলিত মানুষদের মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ নব্বই-এর প্রবুদ্ধ শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই। চন্দ্রকণা, রেণি, সম্বরণ, তমাল ও তামসী পাশে দাঁড়িয়ে। মাথার উপর কপ্টারটা চক্কর কাটছে।

জৈষ্ঠ্যের ভোর এখন সবেমাত্র উঁকি দিয়েছে। ঘড়ির কাঁটায় চারটে। কৃষ্ণপক্ষের প্রথম চাঁদ পশ্চিম আকাশ থেকে এখনও জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। শান্ত স্নিগ্ধ শীতল প্রকৃতি। আলো আঁধারির ছায়াছবি নিবিড় সবুজের ছাউনিতে। সবকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে সবুজদের বুড়োটা। পাঁচটা প্রকান্ড মাথাকে ঘাড়ে নিয়ে খেজুর গাছটা একপায়ে দাঁড়িয়ে প্রায় দেড়শো বছর ধ'রে। বহু ঘটনা, অনেক ইতিহাস তার হৃদমাঝারে দেখা যায়। বঙ্গোপসাগরের তুফান আর কেলেঘাই উপচানো মহাপ্লাবনে রথী-মহারথী কত শত সবুজেরা বেঘোরে প্রাণ দিল, মানুষের ভুলে আগুনে পুড়ল সব কটা মাথা এক সঙ্গে। অথচ প্রকান্ড এই পাঁচমাথা খেজুর গাছটা আজও প্রাণোচ্ছল, সদর্পে মহীয়ান।

একি প্রকৃতির নিছক এক বিস্ময়কর সৃষ্টি! । তাম্রলিপ্তের বহু রহস্য আঁকড়ে ধরে আছে এই গাছটা। এই পাঁচমাথা খেজুরের পাঁচটি গ্রামের নিচেই তো শায়িত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য—তাম্রলিপ্তের আসল বন্দরভূমি। বাণিজ্য তরী আর বণিকের ঘর-বাড়ি, গুদাম ইত্যাদি সব কিছু সমেত। আজ এসবের পুনুরুত্থানের শুভসূচনা।

ফি বছরের মত এবারও পাখিরা বাচ্চা পাড়তে বাসা বেঁধেছিল গাছটার মাথাগুলোতে। বাচ্চা বড় হয়ে উড়ে গেছে তাদের বাবা মায়েদের সঙ্গে। মৌমাছিরাও এখানেই চাক বানায় বসন্তের প্রথমেই। এমন নিশ্চিন্ত নিরিবিলি বাসা বাঁধার জায়গা বুঝি খুব কমই খুঁজে পায় তারা। এবার তিনটে বড় মৌচাক হয়েছিল গাছটাতে। অন্যান্য মৌচাক ভেঙে মধু খায় এখানকার মানুষ। কিন্তু এই চাকগুলো ভাঙেনা। চাক গুলোর সঞ্চিত মধু মৌমাছিদের বাচ্চারাই খায়। আষাঢ়ের বর্ষার আর খুব বেশি দেরি নেই। মৌমাছিরাও বাচ্চাদের মধু খাইয়ে বড় করে সঙ্গে নিয়ে উড়ে চলে গেছে।

এ সময় এ সব অঞ্চলে নারকেল, তাল, খেজুরদের মাথা পরিষ্কারের সময়। এটা পুরুষ গাছ, খেজুর ধরেনা, কিন্তু পুরুষ ফুলে ও পাতার বাগলা বা ডালগুলোতে মাথাগুলো বড্ড ভারি হয়ে যায় এই সময়। তাই, সেলুনে নিজেদের মাথার চুল ছাঁটার মত গাছটারও নিয়ম করে মাথাগুলোয় পুরনো ছাল-ছোবড়া, পাপড়ি, পাতা ও বাগলা সাফাই হচ্ছে। গাছটার সুদীর্ঘ জীবনে মাত্র একবারই কেউ হাঁসুয়া দিয়ে ওর কপালটা ছুলে দিয়েছিল। এর রস নিয়ে গুড় বানাবে বলে। সে প্রায় একশ বছর আগের কথা। তখন গাছটার একটাই মাথা ছিল। বর্ষার শেষে খেজুরের

কপাল কাটার পর, অগ্রহায়ণের শীত আসা পর্যন্ত অন্তত দু' মাস সময় কপালটাকে রসের জন্য শুকোতে দিতে হয়। গাছটার রহস্যের আবির্ভাব ঠিক ঐ সময়টাতেই। দ্বিতীয়বার কপাল কাটতে আসতেই ঐ অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখা গিয়েছিল। ঐ দু' মাসেই গাছটার মাথাটা এমন চওড়া হয়ে গিয়েছিল যে মানুষ আর ওর কাছ থেকে রস চাইতে পারেনি। সেই থেকে আর কোনও দিনও না। গাছটা এতকাল দৈব মর্যাদা না পেলেও খেয়ালী প্রকৃতির রহস্যময় অদ্ভুত আচরণে বিস্ময়কর ভালোবাসা পেয়ে এসেছে বহু মানুষের। ইদানিং দৈবত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে গাছটার। মানুষদের ক্ষেত্রেও তো এভাবেই দৈবত্ব প্রাপ্তি ঘটে তাদের অসাধারণ কাজের পরিচিতিতে। কখনও জীবৎকালে, কখনও বা মৃত্যুর পরে।

পাশের বাঁশ ঝাড়ের অন্ধকার থেকে একটা কোকিল সবেমাত্র ডেকে উঠল—কুহু। দিনের প্রথম ডাক। আর তখনই বেজে উঠল বিদ্যাব্রহ্ম বাবুর হাতের শঙ্খটা। বহু দশক পূর্বে যেটাকে পাওয়া গিয়েছিল গ্রামেরই একটি পুকুর খননের সময়, অন্যান্য বহু শঙ্খের একটি ঝাঁকের মধ্যে। ভোরের উন্মুক্ত চঞ্চল হাওয়া থেকে এক বুক নির্মল শ্বাস টেনে নিয়েছিলেন মাষ্টার মশাই তাঁর নাসিকা ছিদ্র দিয়ে। সেই শ্বাসবায়ু তাঁর নাভিমূল থেকে অনন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে ফিরে এল মুখ গহবরে। ঐতিহ্যময় শুভ্র-শঙ্খটির মুখে এবার মুখ লাগালেন মাষ্টারমশাই। এ যুগের প্রাণবায়ু সঞ্চারিত হল সে যুগের শঙ্খটার মধ্যে। বাঙালির হাজার বছরেরও বেশি ঐতিহ্যের হৃদয়ে। দুটি মুখের মহামিলনের এ এক অভাবনীয় দিব্য মুহুর্ত জন্ম দিল এক রহস্যাবৃত ধ্বনি তরঙ্গের। মুহূর্তে বেজে উঠল শত-সহস্র শঙ্খ এক সঙ্গে। গ্রাম, বিগ্রাম শহর ছুঁয়ে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের বর্তমান তমলুকে ছড়াল সেই তরঙ্গায়িত ধ্বনি। কয়েক হাজার মানুষ এখন রহস্যভূমিতে এসে জড়ো হয়েছে। হাজারে হাজারে এখনও ছুটে আসছে। এক বিশ্ববিমুগ্ধকর তাম্রলিপ্তিক ঐতিহ্যের মহোৎসব শুরু হয়েছে এখানে। কেননা এখানেই তো শায়িত ''বঙ্গভারতী তাম্রলিপ্তি'' বাণিজ্য তরী। বিদ্যাব্রহ্মবাবু ম্যাপ খুলে ধরলেন-সঠিক জায়গাটার উপর বার বার চোখ রাখছেন।

প্রভাত-প্রার্থণা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন পঞ্চগ্রামের কুলপুরোহিত ও গুরুদেবগণ। পাঠ করাচ্ছেন সমবেত সকলকেই।

কেউ কেউ আরাধ্য আকাশ, সূর্য, মাটি ও বৃক্ষ দেবতাকে স্মরণ করছেন। সবশেষে, মন্ত্র নেই, কারও নির্দেশ নেই সবাই প্রণাম করল দেবতুল্য মহাবৃক্ষ পাঁচমাথা খেজুর গাছটাকে। বলছিলাম, ''ইদানিং দৈবত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে গাছটার''। আসলে, শত সহস্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আর যুক্তি - তর্কের ঘাড়ে চেপে প্রকৃতির এক স্বতস্ফূর্ত অভিব্যাক্তি জন্ম লাভ করল সমবেত সব মানুষের অন্তঃকরণে। ধর্ম নয়, বিশ্বাস নয়, কুসংস্কারও নয়। এটা বোধ করি মহানের মাহাত্মের প্রতি সন্মান প্রদর্শন।

তমাল আর তামসীর কাছে এই গাছটি আবার শিব ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পাওয়া এক দৈব-মাহাত্ম্য। আর সেটা বিশ্বাসও করছে গ্রামের লোকেরা। কারণ গ্রামের এক অতি গরিব বাঙালি পরিবারের ছেলে তমাল পাত্র দৈনিক মজুরিতে দিল্লিতে কাজে গিয়ে ভালোবেসে বিয়ে করে এনেছে এক হিন্দীভাষিণী দিল্লি মেয়ে তামসীকে। সেই তামসী তার সুন্দর ব্যবহারে বাঙালিয়ানায় মানিয়ে নিয়েছে অনেকটাই। তার সন্তান ধারণ কালে সে এই খেজুর গাছটার শরীরে বুড়ো শিবের মূর্তি দেখেছে, ডাবের জল খাওয়ানোর আদেশ পেয়েছে, পাশেই নারকেল গাছ, সে গাছের ডাব নিজেই খসে পড়ে ফেটে জল বেরিয়ে সে জল বুড়ো শিবের মাথায় পড়েছে, সবটাই তামসী স্বপ্নে দেখেছে ছবির মত। তারপরের দিন থেকে সে এই গাছটাকে প্রত্যেকদিন ফুল দিয়ে নিষ্ঠাভরে পুজো করে চলেছে।

মনোরঞ্জনবাবু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন

তামসীকে—''এটাতো রাতের ঘুমের সময়ে দেখা স্বপ্নই ছিল। সত্যি নয়। তাহলে এখানে শিব ঠাকুরকে নিয়ে আসছ কেন ? পুজো করছ কেন?" আধা হিন্দী আধা বাংলায় জবাব দিয়েছিল সে—''হামার বাবু তখন পেটে থাইল। আমি ভোর ব্যালায় স্বপন দেখিঠি, আমি ঔঠি গাছটার পাশে যায়্যা দাঁড়ি আছি, গাছটার গায়ে একটা বুড়া বাবা ক'ঠে 'বেটি আমার পূজা-টূজা দওঠনি, আমাকে দুধ আর ডব দ।" ইত্যাদি আরও কত কথা।

গত সাত-আট বছরে এখানকার ভাষা কিছুটা শিখতে পেরেছে তামসী। এই অঞ্চলের ভাষার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলা ভাষার অন্যান্য আঞ্চলিক ধরনগুলো থেকে কিছু ক্ষেত্রে বলা যায় আলাদা। গবেষকরা বলছেন, বর্তমান ওড়িশা রাজ্যের বালেশ্বর জেলার উত্তরাংশ ও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি, এগরা, পটাশপুর, ভগবানপুর এবং তমলুক-মহিষাদল, হলদিয়া অঞ্চলের কিছুটা এলাকা জুড়ে এই অঞ্চলটা ইংরেজ শাসনের আগে মালঝিটা সরকারের শাসনাধীনে ছিল। এই মালঝিটাবাসীদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি অন্যান্যদের থেকে পৃথক ছিল। বেশ আন্তরিক ছিল। আজও আছে। এদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আরও বহু কথা, সে সব পরে হবে। তামসীর কথায় ফিরে আসি। সে তার মাতৃভাষা, শুদ্ধ বাংলা ভাষা, স্থানীয় মালঝিটা ভাষা, উড়িয়া মিশ্রিত স্থানীয় আরও কিছু ভাষ্যশব্দ একটু একটু করে বেশ অনেকটাই শিখে ফেলেছে এ ক'বছরে।

'বঙ্গভারতী তাম্রলিপ্তির' শয়ন স্থলে মানুষের ভিড় বেড়েই চলেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের বিশাল মাঠ, 'গদিমাল' এখন ভিড়ে ঠাসা। এখানকার মানুষরা বলে, এটাই নাকি প্রাচীন সমুদ্র খঁড়িতে এসে দাঁড়ানো নৌকো ও জাহাজের মালপত্র উঠানো নামানোর আসল বন্দর-তীর ভূমি। তারা ব'লে, বঙ্গভারতী তাম্রলিপ্তির মত আরও বহু নৌকো ও জাহাজ এখানেই শায়িত আছে।

এখন এ-স্থলের সংযোগকারী রাস্তাগুলোয় মানুষের সারি ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। এত ভিড়েও সবাই কিন্তু সুশৃঙ্খল। ধাক্কাধাক্কি- ঠেলাঠেলি একেবারেই নেই। বুঝি-বা এটাই এখানকার পৌরাণিক যুগ থেকে চলে আসা সুপ্রাচীন রীতি ও ঐতিহ্য।

প্রত্নতাত্ত্বিক 'রিমোট সেন্সিং' পর্যবেক্ষকগণ ইতিমধ্যেই আকাশ থেকে তোলা মাটির নীচের ছবির উপর তাদের রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এইমাত্র তারা খবর পাঠিয়েছে, যে তারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিচার প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু করেছে। যেখানে যে পুরাতাত্ত্বিক জিনিস আছে তারা বলেছিল সেখানকার বদলে নাকি অন্য কোথাও আছে। যতক্ষণ না নিশ্চিত নির্দেশ আসছে, ততক্ষণ কাজ শুরু করা যাবে না। মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল দুঃসংবাদটা। গুঞ্জন শুরু হলেও গোলমাল শুরু হয়নি। বরং নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে দিল পাশের গ্রাম থেকে আসা 'থালা দর্পণ' গুনীন মান্তু শেখ। এর আগে বহুবার সে থালা দর্পণে দেখিয়েছিল মাটির নিচে কোথায় কী আছে। কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ করেনি। বলেছিল পাঁচমাথা খেজুর গাছটার লাগোয়া উত্তর-পশ্চিমের মাঠের নিচে একটা ভীষণ শক্ত কোনও বিরাট বস্তু আছে। তার থালা দর্পণে সে দেখিয়েছিল একসময়। তারপর যখন এক সরকারি অফিস এখানকার বিভিন্ন জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানে মাটিতে ড্রিল করে প্রকৃতির গ্যাসের অবস্থান পরীক্ষা করতে এল, ওরা ঠিক এই জায়গাতেই মাটির নিচে এমন কঠিন পদার্থ কিছু পেল যে ড্রিল মেশিন সরিয়ে নিতে বাধ্য হল। মনোরঞ্জনবাবু একবার ড্রিলিং ইনচার্জ বাবুর কাছে গিয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় গুনীনের রহস্য উন্মোচনের জন্য। জবাব পাননি। বলেছিলেন, উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হয়তো জবাব দিতে পারবেন। সেই কর্তৃপক্ষের ঠিকানা দিয়ে তিনি মনোরঞ্জনবাবুকে সাহায্য করেছিলেন। মনোরঞ্জনবাবু সেই ঠিকানায় গিয়েও কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেননি এখনও। গুনীনের লোকঠকানো বুজরুকি থালা-দর্পণ বিদ্যা অনেকের মনের মধ্যে উজ্জ্বল ছাপ

ফেললেও এই খনন উদ্যোগের কোনও কর্মকর্তাই থালা দর্পণকে আমল দেননি। এ উদ্যোগ তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত প্রসূত।

সূর্যোদয়ের সময় প্রায় হয়ে গেছে। ঢাকের কাঠি এখনই নাচতে শুরু করবে। কোদালের কোপ এখনই পড়বে মাটিতে। সমবেত মানুষরা এখন কৌতূহলে উদ্দীপিত, উদ্বেলিত। আর অন্যদিকে রিমোট সেন্সিং অথরিটির ইঞ্জিনিয়ারগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমস্যায় জর্জরিত। সূর্যোদয়ের আর তিন মিনিট বাকি। সকলে সচকিত দৃষ্টি ভেদ করে বেশ দুরন্ত গতিতে একটি ক্ষণকাল বা মুহূর্তের উদয় হল। বেশ বড় মোটা একটি কাঠের 'লগ' কাঁধে সবার মধ্যমণি হয়ে উদয় হল গ্রামের শচীন। এই সেই কাঠ খন্ড যেটা ঐ বঙ্গভারতী তাম্রলিপ্তি বাণিজ্য তরীটির শরীরের একটি অংশ। বছর বারো পূর্বে তরীর শরীর ছেড়ে উঠে এসেছে মানুষের হাতে। অপেক্ষায় আছে প্রত্নতাত্ত্বিক সদগতির। গবেষক-বৈজ্ঞানিকগণ আগেও দেখেছেন পরীক্ষাগারে। কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অভাবে অবহেলায় পড়ে আছে এতদিন।

শচীন মান্না। পাঁচমাথার পাশেই বাড়ি। বাড়ির লাগোয়া ছোট্ট পুকুর, দশ-বারো কাঠার মতো জায়গা জুড়ে জল হবে। এর আগে কেউ কোনওদিন পুকুরটা খনন করেছে বলে কারও জানা নেই। আসলে ওটা ঠিক পুকুর ছিল না। ছোট্ট একটা ডোবা ছিল। সেবার, বছর বারো পূর্বে পুকুর বানাতে গিয়েই পাওয়া গেল একটি নৌকো। হয়তো নৌকো নয়। একটা জল-জাহাজও হতে পারে। এখনও সঠিক কেউ বলতে পারেনি, কেননা নৌকোটার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ অংশ পোঁতা আছে পুকুরের পাড় ও অন্য জমি-মালিকের ডাঙা ও জঙ্গলের নিচে। কিন্তু যতটুকু অংশ ডোবা-পুকুরে দেখা গেছে তাতে শচীন ও অন্যান্য বহু লোকে অনুমান করেছে যে নৌকোটা লম্বায় সত্তর-আশি ফুট তো হবেই। আর কাঠগুলো এখনও এতই মোটা যে এগুলো ছোট্ট নৌকা নয়। ক্ষয়ে গিয়েছে অনেকটাই। তবু শক্ত-পোক্তই আছে। ধোয়া-মোছা পরিষ্কার করে কোনও বিশেষ পদ্ধতিতে প্রায় পূর্বাবস্থায় আবার ফিরিয়ে আনা যেতেই পারে। পঞ্চগ্রামের মানুষদের এটাই মনে হয়েছে।

খেটে খাওয়া তাগড়াই শরীরের মোটা কাঁধ শচীনের। প্রায় ষাট-সত্তর কেজির লম্বা কাঠটাকে দিব্বি কাঁধে নিয়ে ভিড়ের মাঝে সে দাঁড়িয়ে রইল। ভিড়ের থেকে কেউ একজন বলে উঠল, ''এটাকে এঠি লেউস্যু কেনি'' (এটাকে এখানে নিয়ে এসেছিস কেন?)। আর একজন, ফনি কুইলা, তার জবাব দিল, ''লেইস্যু ঠিক করছু (নিয়ে এসেছিস ঠিক করেছিস)। দ্যাখা সক্কলকে।'' তারপর সে ও আরও কয়েকজন মিলে শচীনের কাঁধ থেকে কাঠটাকে নামিয়ে মাটিতে রাখল। ফনি-ই যুক্তি পেশ করল সবার কাছে, ''এটাই তো গেড়িয়ায় থাইল, আমান্নে মাটি কাটতে যায়া পাইথলি। গটাটা ত বামো'হারে পড়্যাটার তলায় রইছে; পুরা বোট-টা ত দ্যখাইঠেনি'' (এটাই তো পুকুরে ছিল, আমরা মাটি কাটতে গিয়ে পেয়েছিলাম। গোটাটা তো বামুনদের পড়ে থাকা জায়গাটার নিচে রয়েছে; পুরো বোট-টাকে তো দেখা যাচ্ছেনা)।

পরক্ষণেই প্রায় দশজন গ্রাম্য মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত দল সামনে এগিয়ে এসে গড়গড় করে বলতে শুরু করল, তাদের নিজেদের ভাষায়, ''তুমান্নে ত জাঁওঁ, এঠি কতগা নৌকা কুণ্ঠি কুণ্ঠি বারিবে (তোমরা তো জানো যে, এখানে কতগুলো নৌকা কোথায় কোথায় বেরোবে)।'' জায়গাগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ''হা এঠি ৫৮ দাগে বারিথল, ওটি ৫৯ দাগে বারিথল, খালি নৌকা, বোট কেনি, কত্ত কিছু বারিইছে। কামল্যা হারে ডবায় ত কুঁয়া বারিইল, আউর ব্যাবাক জায়গায় কতগা কি কি বারিইল। আর তুমরা অখঁনঁ ক্যঠ, 'ভাবিঠি'। কও ত অদগা থাইল কাই?'' (এই যে এখানে বেরিয়েছিল, ওখানে বেরিয়েছিল, শুধু নৌকা কেন, কত কিছু বেরিয়েছে। কামিল্যাদের ডোবাতে তো কুঁয়া বেরিয়েছিল, আরও সমস্ত জায়গায় কত কী কী বেরোল। আর তোমরা

এখনও কইছ (বলছ) ভাবছি। বল তো এতসব ছিল কোথায়?) রেণি নতুন ভাষায় অদ্ভুত সব কথাগুলোকে বুঝবার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কথাগুলি শুনল ভিডিও কনফারেন্সের অপর প্রান্তে থাকা রিমোট সেন্সিং কর্তৃপক্ষ, যেখানে সিদ্ধান্ত আটকে আছে। হয়তো বা তাঁরা প্রভাবিত হলেন। চমৎকারী ঘটে গেল। দেরি না করেই তাঁরা সম্মতি দিয়ে দিলেন।

সূর্য উঠতে আর মাত্র আধ মিনিট বাকি। বাঁধের উপরে পূবদিকের সারিতে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটা ঢাকি। বাকিরা পাঁচমাথার নিচে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকে প্রথম কাঠি দেবে ঐ বাঁধে দাঁড়ানো ঢাকিরা। সেই ঢাকের প্রথম শব্দ পেতে কান পেতে রয়েছে সবাই। প্রথম শব্দে মাটিতে কোদাল চালানোর প্রথম নির্দেশ দেবেন মনোরঞ্জনবাবু। সব শেষে সব অপেক্ষার অবসান এখনই ঘটবে। সূর্যদেব পূর্বদিগন্তে উঠবার জন্য প্রথম উঁকিটি এইবার দেবেন। আজকের এই ভোর ৫টা ৪৮মিনিট ১০.৫ সেকেন্ড সময় মুহূর্তটা ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে তাম্রলিপ্ত বন্দরস্থলের পুনরুত্থানের গৌরবময় বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

অবশেষে সূর্যদেবের প্রথম উঁকি দেখা গেল। পাঁচটি ঢাক আর পাঁচটি শঙ্খ বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাকি ঢাক আর শঙ্খগুলো বাজতে শুরু করল। মনোরঞ্জনবাবু এক নিমেষেই চোখে চোখ মিলিয়ে সম্মতি নিয়ে নিলেন ভিডিও কনফারেন্সে থাকা আকাশবাবুদের। আর নিজের চারপাশে থাকা পরামর্শদাতা সব গুরুদেবদের।

তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেন কোদালিয়া দলটিকে।

শচীনের কাঁধের কাঠটা যে পুকুরে ঠিক যেইখানটিতে পাওয়া গেছে সেইখানেই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কোদালের প্রথম কোপটি মারল হাবাসুপাই কন্যা রেণি লিউইস, তার পরের কোপ পড়ল চন্দ্রকোণার কোদাল থেকে। সঙ্গ দিল একসঙ্গে তমাল ও তামসীরা মিলে কুড়ি জনের কোদালিয়া দলের সবাই। ঝুড়িতে মাটি ভরে নিতে প্রথম ঝুড়িটি এগিয়ে দিল শ্রীলা, রবীন, মালতী, রমেশ ও ললিতা। যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় মাটি খুঁড়ে চলেছে। মোট একশ জনের দলের বাকিরা ঝুড়িতে মাটি ভরে নিয়ে গিয়ে ফেলছে পাশের বড় বাঁধটাতে। কেলেঘাই নদীর প্লাবন থেকে এই এলাকাটিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এই বাঁধটি বাঁধা হয়েছিল ইংরেজ আমলে।

এখন মাটি কাটা চলছে। কোদাল দিয়ে। মেশিনে মাটি কাটার উপযুক্ত জায়গা নয় এটা, তাছাড়া মেশিনে মাটি কাটায় আনন্দ নেই। ঘণ্টা দুয়েক সময় ধরে মাটি কাটলেই নৌকো বেরোবে। এখানে জড়ো হওয়া মানুষরা সবাই জানে। কারোরই আজ আর অন্য জরুরি কাজ নেই। সবাই উৎসুক কিছু দেখার জন্য। দেখার বিষয় দুটি—এক, বঙ্গভারতী তাম্রলিপ্তিকে উত্তোলনের উদ্যোগ অনুষ্ঠান। আর দুই, এই উদ্যোগে আকর্ষণীয় সহযোগী অনুষ্ঠান এই গ্রামেরই গৌরব, দেশ-বিদেশে সুবিখ্যাত একেবারেই নতুন পদ্ধতিতে বেণীপুতুল নৃত্য প্রদর্শনী। যার স্টেজটাই তৈরি হয়েছে পাঁচমাথা খেজুর গাছটাতে। সাহায্য নেওয়া হয়েছে পাশেই পুকুরে পোঁতা কয়েকটি খুঁটির ও নারকেল গাছ ও তাল গাছ ইত্যাদির, যেগুলো পুকুরের চারদিকে রয়েছে।

এখন, এই কাকভোরেই পাঁচ মাথা খেজুর গাছে বিশ্ববিখ্যাত বেণীপুতুল নাচ শুরু হয়েছে। তাও আবার এই পঞ্চগ্রামেরই শিল্পীদের দিয়ে। মূল নৃত্য-পালাটির নাম 'মহাভারত, পুরাণ ও ইতিহাসে তাম্রলিপ্ত।' ছোট ছোট ভাগে অনেকগুলি পালা। এ এক বিরল, অপূর্ব নৃত্য দৃশ্য। অভিনব ব্যবস্থাপনায়। এরপর হবে কয়েকটি লোকনৃত্য ও লোকসংগীত। তারপর গল্পদাদুর আসরে গল্প বলবেন বিদ্যাব্রহ্মবাবু—তাম্পলিপ্তের ও বাংলার রাজা-প্রজাদের গল্প।

রবীন মালতী রমেশরা এখন মাটি কাটছে। রেণি চন্দ্রকোণা সম্বরণরা এখন বেণীপুতুলে। সবশেষে গল্পদাদুর আসরে তাম্রলিপ্তের গল্প শুনতে থাকবে ওরা। আসর চলবে অনেকদিন—শুনতে থাকবে ওরা অনেকদিন—অনেকদিন—অনেকদিন।

যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার

মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এ দেশে প্রাচীন প্রচলিত পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা, পরম্পরা, বিধি-নিয়ম ও রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে মেয়েদের মালিকানার অধিকার নিয়ে, অধিকারের মাত্রা ও তার ধরন নিয়ে এই লেখা। লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন ও নারীদের উপর হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষদের অন্যায় ও অমানবিক যুক্তিতে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চনার কথা উঠে এসেছে এখানে। আটশ বছরের ঐতিহাসিক ধারণাকে রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে লেখাটি তৈরি হয়েছে। নারী বা পুরুষের মানবাধিকারের এই ঐতিহাসিক ভাবনাটা কিভাবে ধাপে ধাপে ২০০৫ সালের কেন্দ্রিয় আইন ও অবশেষে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮তে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হল, সেই ঘটনাক্রমই এই লেখায় আলোচনা করেছেন মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কেলেঘাই নদির দক্ষিণ-পূর্বে পাঁচমাথা গ্রাম। প্রায় বারশ বছর আগের তাম্রলিপ্ত যুগের গভীর চওড়া নদি মোহনা এখানেই ছিল। এখন সরে গেছে মন্দারমণি, কাঁথি -দীঘার দিকে। পলিভরা বিশাল ভূখন্ডে তারপর একে একে এসে বসতি স্থাপন করেছে মানুষ। প্রায় পুরোটাই এখন হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। পাঁচমাথা গ্রামের চৌধুরি পরিবার এখানে আসে প্রায় পাঁচ-পুরুষ আগে। পরিবারের সম্পত্তি ভাগ হবে এবার।

পরিবারের বর্তমান প্রজন্মে আছে চার ভাই পাঁচ বোন। বাবা প্রকান্ড চৌধুরি মারা গেছেন পঁচিশ বছর আগে। মা মলিনাদেবীও কুড়ি বছর আগে। বড় ছেলে প্রখন্ড চৌধুরি মারা গেছেন পনের বছর আগে। তার বিধবা স্ত্রী কমলা (পরিবারের সবার বড় বৌদি) ও তাদের ছোট ছেলে প্রবন্ধ চৌধুরি এখন পাঁচমাথা গ্রামে পারিবারিক জমিতে বসবাস করে, সব সম্পত্তির দেখাশোনা করে। অন্যানারা কেউ এখানে বসবাস করেনা, দূরে অন্য জেলায়, অন্য রাজ্যে থাকে।

পরিবারের মেজ ভাই, করাল চৌধুরী, যে কোনও দিনই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়নি, সে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারায় নিজেকে আইনি কর্তা মনে করে। চতুর্থ ভাই, স্ব - ঘোষিত আইনজ্ঞ, হুকুম জারি করল-বোনেরা সম্পত্তির ভাগ পাবেনা, বলল আইনে নেই। তিন বোন বিয়ে করেছে বিধর্মীকে-একজন অ-বাঙালি কেরালিয়ানকে, এক বোন মুসলমানকে আর এক বোন সাঁওতালকে, তাছাড়া বাবা মারা গেছেন ২০০৫ এর আগে, আর এদের বিয়ে হয়ে গেছে ২০০৫ এর আইনের আগে। এক বোনের বিয়ে হয়নি, আর এক বোন স্বামী-শ্বশুরবাড়ি ছাড়া হয়ে বড়বৌদির কাছেই থাকে। আইনে তিনবোনের ভাগ নেই,

দুবোনের আছে। আর এক ভাই এই দু-ভাইকে সঙ্গ দিয়ে ফরমাইস জারি করল---''আমরা আমাদের অংশ ভাগ-বাঁটোয়ারা না করেই, কোনও অংশীদার ভাই বোনকে না জানিয়েই যে যার অংশ যাকে খুশি বিক্রি করে দেব, আইনে বাধা নেই। এজন্য আমাদের গ্রামে যাওয়ারও দরকার নেই। যে জমিজমা কিনবে সে বুঝে নেবে। আইন তাদের পাইয়ে দেবে।"

অ-বিভাজিত সম্পত্তির এখনও মালিক মৃত প্রকান্ড চৌধুরি। কাউকে কোনও সম্পত্তি 'উইল' করে যাননি। সাবেক কালের সকলের ভাগের বাস্তুবাড়িটা কেলেঘাই নদির বন্যায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। বড় বৌদি আর তার ছোট ছেলে নিজের টাকায় আর সরকারের বন্যাদুর্গতদের জন্য দেওয়া টাকায় নতুন বাড়ি বানিয়ে বসবাস করছে, সম্পত্তির দেখাশোনা করছে। স্ব-ঘোষিত আইনজ্ঞ ভাইটি এখন সেই বাস্তুবাড়ির মধ্যেও অংশভাগ চাইছে। আইনে নাকি আছে।

কী করে ভাগ হবে চৌধুরি পরিবার? সবার বড় বৌদির অনেক বয়স, ঝুট-ঝামেলা আর নিতে পারবেনা। তাছাড়া এত টাকাও নেই, সময় নেই, কোর্ট-হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্ট থেকে ফয়সালা নিয়ে এসে সম্পত্তির অধিকার ভোগ করবে! সম্পত্তি থাকলেও তার থেকে বার্ষিক আয় খুবই কম। অংশীদার মেয়েদের আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। ভাই-বোনেদের সম্পর্ক ভালো রাখার আনন্দ পেতে নিজেদের ভাগটা যে ছেড়ে দেবে সেও হবেনা। কা'কে দেবে আর কা'কে দেবেনা। কোর্টে যাওয়ার আগেই তো বাদী-বিবাদী পক্ষে ভাগ হয়ে গেছে দাদা ভাইয়েরা। গ্রাম কমিটি, পঞ্চায়েতের শুভানুধ্যায়ীরা থাকলেও তাদের কথা সব ভাই মানবে কেন!

অতএব চৌধুরি পরিবারের সম্পত্তির ভাগাভাগিটা হবে কি করে? বড় বৌদি বানরের পিঠে ভাগের গল্পটাই শুনিয়ে দিল আমাকে—বলে, ভাগে আর কতটুকু পাব! কোর্ট-কাছারি সেরে দেখা যাবে শেষে বানরটাই গোটা পিঠের সব টুকরোগুলোই খেয়ে নিল, পিঠেটা ভাগ করে দেওয়ার কাজের পারিশ্রমিক দাবি ক'রে। ঝগড়ুটে বিড়াল দুটো কেবল ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে রইল ঝগড়া মিটাতে তাদেরই ঠিক করা তৃতীয় পক্ষ বানরটার মুখের দিকে। যখন আর কিচ্ছু করার নেই, তখন পরস্পর বন্ধু দুই বিড়াল বললে-হায়রে! বানরের এই দাঁড়িপাল্লা নিয়ে পিঠে ভাগের কায়দাটা যদি আগে জানতাম তাহ'লে কেমন সুন্দর নিজেরাই ভাগ করে নিয়ে খেতে পারতাম।

ঠিক কথা। স্ব-ঘোষিত আইনজ্ঞ আদরের ভাই আমার বলে দিল আইনে দিদির ভাগ নেই। বলে দিলেই হল। দিদিরা, বোনেরা, বৌদিরা কি নিজেরা জেনে নিতে পারেনা! কোর্টে যাওয়ার আগেই তো জেনে নিতে পারে তাদের প্রাপ্যটা কি, কতটা আর কি সর্তে। আগে কি ছিল, এখন কি আছে? আইনি ইতিকথাটা না হয় একটু বড়। তা'তে কি আছে, ভীষণ কঠিন তো কিছু নয়। 'আইন বড়ই জটিল, বড্ড তার কচকচানি'—এমনটা না মনে ক'রে গল্পচ্ছলে বিষয়টাকে বলে গেলেই তো হয়। রাজি হল যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির বর্তমান উত্তরাধিকারদের মধ্যে পরিবারের বড় বিধবা কমলা বৌদি, তার ছোট ছেলে প্রবন্ধ (বড় বাইরে থাকে, এসবে থাকেনা) আর পাঁচ বোন। শুরু করি তাহলে, শুধু চৌধুরি পরিবারের ওরা কেন, সবাই জানুক কোর্টে যাওয়ার আগেই। আর কোর্টে গেলেও খুব সুবিধা হবে উকিল আর বিচারককে বলতে আর বোঝাতে। আইনের উদ্দেশ্য, দর্শন, ইতিহাস বা ইতিকথার কিছুই না জেনে, না বুঝে কেবল আইনের কয়েকটা ধারা বলে দিলেই আইনি লড়াই জেতা যায়না। যে যত বেশি জানবে বুঝবে সে তত বেশি সুফল পাবে। আইন জানা আর আইনটাকে বোঝা এক নয়। এই অনুভব নিয়েই আজকের লেখাটির উপস্থাপন—

এক

অন্ত থেকে শুরু করে আদিতে যাওয়া, আর পরিশেষে

নারী-পুরুষের পারিবারিক সম্পত্তিতে অধিকার ও সমতার মূল মানবিক দর্শনটাকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলাই এই ইতিকথাটির উদ্দেশ্য। অন্তভাগে, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বিষয়ে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮-তে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া একটি রায়ের পরে ভারতবর্ষে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে এদেশের বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সহ হিন্দু মেয়েদের মালিকানার অধিকারটি কী ও কোন্ যুক্তিতে কেমন, আর অন্যান্যদের কেমন তা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়।

আদিতে, চার-পাঁচ হাজার বছর পূর্বে প্রাক্-আর্য, প্রাক্-বৈদিক সময়ে কোন্ যুক্তিতে পরিবারের নারীরা কেমন অধিকার ভোগ করত, যার প্রভাবে আজকের উত্তরাধিকার আইন অনেকটাই প্রভাবিত, তা পরিবারে নারীদের অবস্থান ও অধিকারের আদি চিত্র।

মাঝের প্রায় তিন হাজার বছর সময়ে কেন পরিবারে ও সমাজে এত নারী-বিদ্বেষী নীতির প্রবর্তন, অধিকার থেকে নারীদের কেন এত বঞ্চনা যার প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে এত বড় দুটি পারিবারিক সম্পত্তি বিষয়ক বিভাজন-'মিতাক্ষরা' মত আর 'দায়ভাগ' মত বিভাজন-এসব আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ঐতিহাসিক চিত্র, পারিবারিক সম্পত্তির আইনি ইতিকথা।

বঙ্গবাসীদের এবং বঙ্গপ্রেমী অসমীয়াদের একটি যুগান্তকারী ভাবদর্শন-'দায়ভাগ' দর্শন কীভাবে ভারতবর্ষের বাকি সমগ্রদের 'মিতাক্ষরা' দর্শনের ওপর অবশেষে সম্পূর্ণভাবে আইনি প্রভাব প্রতিষ্ঠা করল, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, জিউজ ধর্মাবলম্বী পরিবারের মেয়েদের এবং উক্ত ধর্মীয় ও সামাজিক পরম্পরার বাইরে মূল আদিবাসী পরিবারের মেয়েদের পিতৃপুরুষদের সম্পত্তি ও পিতার সম্পত্তি পরিবারের কোন্ মেয়ে কতটা কি ভাবে অথবা আদৌ পাবে কি না, কেন পাবে আর কেন পাবেনা—এসবই আলোচ্য ইতিকথাটি বলবে।

দুই

ভারতবর্ষের বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন সহ হিন্দু ধর্মাবলম্বী যৌথ পরিবারে পিতৃপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিবারের মেয়েদের মালিকানার অধিকার বিষয়ে ১৯৫৬ সালে পাশ হওয়া হিন্দু উত্তরাধিকার (সাকসেশান) আইন এবং ২০০৫ সালে এই আইনের কয়েকটি ধারার সংশোধনী আইনের উপর বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি মামলায় বোম্বে হাইকোর্ট, দিল্লি হাইকোর্ট, কর্ণাটক হাইকোর্ট আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে বলে,

(ক) ২০০৫-এ সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পরে জন্ম হওয়া কন্যাসন্তানরা পিতৃপুরুষদের থেকে পিতার প্রাপ্ত যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির অংশীদারি ভাগ পাবে না।

(খ) সুপ্রিম কোর্ট আরও একধাপ এগিয়ে ২০১৫ সালে আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে বলে যে ২০০৫-এর সংশোধনী আইন লাগু হওয়ার পূর্বে যে কন্যা সন্তানদের পিতা মারা গেছে সেই সন্তানরা পিতৃপুরুষদের থেকে পিতার প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশীদারির ('কো-পার্সেনার'-এর) ভাগ পাবে না।

(গ) পরিষ্কার ছিল না এই ধারণাটাও—১৯৫৬ সালের পূর্বে যেসব মেয়েদের জন্ম হয়েছে তারা ১৯৫৬ সালের আইন ও ২০০৫-এর সংশোধনী আইনের আওতায় এসে সম্পত্তির ভাগ পাবে কি না।

ফেব্রুয়ারি ২, ২০১৮ দিনটি পারিবারিক যৌথ সম্পত্তির অংশীদারি স্বত্বে ভারতবর্ষে 'নারী-পুরুষের সমানাধিকার' অর্জনের ঐতিহাসিক বিজয় দিবস। প্রায় তিন হাজার বছরের নারীবিদ্বেষী পারিবারিক অমানবিকতার বিলুপ্তি ঘটল মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নারী-হিতৈষী একটি আইনি ব্যাখ্যায়। মূল আইনটা কিন্তু ১৯৫৬ সালের, আর বিশেষত, এর সংশোধনী আইন, ২০০৫-এর। এই আইনি ব্যাখ্যাটি দেশের 'মিতাক্ষরা' নিয়ম অনুসরণকারী হিন্দু পরিবারদের তিন পুরুষের সম্পত্তিতে চতুর্থ পুরুষদের

জন্মগত অধিকারের উপর প্রযোজ্য। হিন্দুদের অন্য ভাগ 'দায়ভাগ' নিয়ম অনুসরণকারীরা এই অধিকার নিয়মের নিজস্ব দর্শন অনুসারে আগে থেকেই ভোগ করে আসছে, তবুও এই ব্যাখ্যা এদের উপর প্রযোজ্য। অন্যান্য ধর্মীয় ও আদিবাসীদের যে যার নিজস্ব আইন (পার্সোনাল ল) এবং সামাজিক বিধি আছে; প্রযোজ্য আছে ইন্ডিয়ান সাকসেশান অ্যাক্ট-১৯২৫ ও অন্যান্য আরও কিছু।

সুপ্রিম কোর্ট তার সর্বশেষ আইনি ব্যাখ্যায় বলল—

(ক) ২০০৫-এর পূর্বে মারা যাওয়া মেয়ের ছেলেমেয়েরা এখন তাদের মায়ের প্রতিনিধি হিসাবে মায়ের পিতৃপুরুষদের যৌথ সম্পত্তির অংশীদারির ('কো-পার্সেনার' হিসেবে) জন্মগত অধিকারে ভাগ পাবে;

(খ) ২০০৫-এর পূর্বে বাবা মারা গেলেও মেয়েরা উক্ত সম্পত্তির অংশ পাবে;

(গ) ২০০৫-এ সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পরে জন্ম হওয়া মেয়েরাও এই সম্পত্তির অংশ পাবে।

(ঘ) ১৯৫৬ সালের আগে যেসব কন্যা সন্তান জন্মেছে তারা এই সম্পত্তির ভাগ পাবে না বলে যে আবেদন আদালতে করা হয়েছিল তা খারিজ করে দিয়ে আদালত বলে যে, তারাও পাবে। (কন্যা সন্তান —বিবাহিত ও অ-বিবাহিত দুই-ই)।

তিন

আইনসমূহের পরিচিতি :

এদেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক বিভাজন নির্ভর পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনগুলি কি কি? পরিবারে মেয়েদের স্বত্বাধিকারের বিভিন্ন রূপগুলিই বা কেমন, দেখে নিই।

আমাদের দেশে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সামাজিক বিধি-নিয়ম আর দেশের সরকারের বানানো আইনসমূহ সারা দেশের পরিবার, সমাজ, ধর্ম এমনকী জাতি সমূহের নানান চারিত্রিক বিভাজন ঘটিয়েছে। অর্থাৎ ভারতবাসীদিগকে, বিশেষ করে পরিবারের নারী সমাজে তাদের সম্পত্তির অধিকার ভিত্তিক বিভাজন ঘটিয়েছে। এই বিভাজনের ভাষ্যচিত্রটির উপর চোখ রাখি—

(ক) আইনসমূহ

১) হিন্দু সাকসেশান (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০০৫;

২) হিন্দু সাকসেশান অ্যাক্ট-১৯৫৬;

৩) স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট-১৯৫৪ (সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনি ধারাযুক্ত)

৪) মুসলিম পার্সোনাল ল (শরিয়ত) অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট-১৯৩৭;

৫) হিন্দু রাইট টু প্রপার্টি অ্যাক্ট-১৯৩৭;

৬) মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশান অফ রাইটস অন ডিভোর্স) অ্যাক্ট-১৯৮৬;

৭) হিন্দু ল অফ্ ইনহেরিটেন্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট-১৯২৯;

৮) ইন্ডিয়ান সাকসেশান অ্যাক্ট-১৯২৫;

৯) কৃষি-জমির উত্তরাধিকার স্বত্ব বিষয়ক বিভিন্ন রাজ্যের নিজস্ব আইন (টেনেন্সি অ্যাক্টস);

১০) আদিবাসীদের বিভিন্ন সমাজের নিজেদের প্রথাগত বিধি-নিয়ম;

১১) জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর হিন্দু সাকসেশান অ্যাক্ট-১৯৫৬;

১২) জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর খ্রিষ্টান ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স অ্যাক্ট-১৯৫৭;

১৩) গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-১৯৩৫;

১৪) পারিবারিক যৌথ সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার সম্পর্কিত অন্যান্য বিবিধ আইনের প্রযোজ্য

ধারাসমূহ (ভারতীয় সংবিধান, জাতিপুঞ্জ-UNO-র 'সেডও'-CEDAW-Convention on the Elemination of all forms of Discrimination Against Women, যা ভারতেও প্রযোজ্য, মানবাধিকার আইন-১৯৯৩, জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট-১৮৯৭, উপজাতিদের রাজ্যভিত্তিক বানানো বিশেষ ভূমিরক্ষা বিষয়ক আইন ইত্যাদি)

(খ) হিন্দু সাকসেশান (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট-২০০৫ ও নারীর অধিকার :

১৯৫৬ সালের হিন্দু সাকসেশান অ্যাক্টের ৬নং ধারাটির সংশোধন করে বলা হয়েছে—মিতাক্ষরা মতাবলম্বী হিন্দু পরিবারে একজন 'কো-পার্সেনার'-এর মেয়ে;

১) পিতৃপুরুষদের সম্পত্তিতে জন্মগত সূত্রে ছেলেদের মতই সমানভাবে তার নিজের অধিকারে 'কো-পার্সেনার' হতে পারবে;

২) কো-পার্সেনারি সম্পত্তিতে তেমনই অধিকার পাবে যেমনটা, ও যদি ছেলে হতো, তাহলে পেত;

৩) 'কো-পার্সেনারি সম্পত্তিতে মূল আইনে (১৯৫৬) যে দায়দায়িত্ব ছেলেদের উপর অর্পিত হয়েছে এই সংশোধনীতে মেয়েদের উপরও একই দায়দায়িত্ব অর্পিত হল;

৪) 'হিন্দু মিতাক্ষরা কো-পার্সেনার' নামক ভাবধারাটির মধ্যে কো-পার্সেনারের মেয়েও অন্তর্ভুক্ত।

এসব অবশ্য এই শর্তে যে ২০০৪-এর ২০ ডিসেম্বরের আগে কো-পার্সেনারের জমি ভাগাভাগি ইত্যাদি বিষয়ক যা ঘটে গেছে তাদের কোনও ক্ষতি হবে না।

এমনই আরও নানান ধারা সংযুক্ত বা সংশোধন করে পুরুষ ও নারীদের অধিকারে সমতা আনার আইনি প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টাতে ব্যবহৃত কয়েকটি আইনি শব্দের পরিভাষা জেনে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে (সংক্ষেপে)—

(ক) মিতাক্ষরা—একাদশ শতাব্দীতে স্মৃতিশাস্ত্রকার বিজ্ঞানেশ্বর দ্বারা প্রচলিত। তিনপুরুষের যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি চতুর্থ পুরুষ বা পুরুষেরা এবং তার বা তাদের একমাত্র পুরুষ সন্তানরা জন্মগত অধিকারে সমানভাবে পাবে। মেয়েরা পাবে না। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, ওড়িশার বাঙালি ও বাঙালি অনুসারি ছাড়া ভারতবর্ষের বাকি সব জায়গার হিন্দুরা এই মতাবলম্বী। বাবা বেঁচে থাকতেই ছেলেদের সমানাধিকার।

খ) দায়ভাগ---দ্বাদশ শতাব্দীতে স্মৃতিশাস্ত্রকার জীমূতবাহন দ্বারা প্রচলিত। পিতৃপুরুষদের সম্পত্তি আর পিতার নিজের অর্জিত সম্পত্তির মধ্যে কোনও বিভাজন নেই, মিতাক্ষরাতে আছে। মেয়েদেরও এখানে সমান অধিকার, যা মিতাক্ষরাতে নেই। বাবার বা সম্পত্তির মূল মালিকের মৃত্যুর পরই 'উইল' না করে যাওয়া সম্পত্তির উপর স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে ইত্যাদিদের সমানাধিকার জন্মাবে। মিতাক্ষরাতে যা জীবিতকালে জন্মায় একমাত্র কো-পার্সেনারদের (যেখানে মেয়েরা বাদ)।

(গ) কো-পার্সেনার—তিনপুরুষের যৌথ পারিবারিক সম্পত্তিতে চতুর্থ পুরুষ বা পুরুষেরা এবং তার বা তাদের একমাত্র পুরুষ সন্তানরা জন্মগত অধিকারে উক্ত সম্পত্তির দাবীদার হন। পিতার নিজের অর্জিত সম্পত্তির নয়। মেয়েরা মিতাক্ষরার নিয়মে কো-পার্সেনার নয়, বর্তমানে সংশোধিত আইনে কো-পার্সেনার।

(ঘ) সারভাইভারশিপ নিয়ম—মিতক্ষরাতে এই কো-পার্সেনারদের দলের একজন কেউ মারা গেলে তার

ভাগের সম্পত্তিটা যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়ে যুক্ত হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির পুরুষ বংশধররা পাবে না (অন্য কোনও নারী বা মেয়েরা এখন প্রত্যেকে তিনভাগের একভাগ করে পাবে, অর্থাৎ পরিমাণে বেশি হিসাবে পাবে)।

(ঙ) **অ্যানসেসট্রাল সম্পত্তি**—তিন পুরুষের যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি চতুর্থ পুরুষ বা পুরুষদের কাছে যা জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত।

(চ) **প্যাটারনাল সম্পত্তি**—পিতার নিজের অর্জিত সম্পত্তি এবং অ্যানসেসট্রাল সম্পত্তির নিজের ভাগের অংশ।

(ছ) **টেস্টামেন্টারি ও ইনটেস্টেড সাকসেশান**—মৃত্যুর আগে উইল করে যাওয়া (টেস্টামেন্টারি) ও উইল না করে যাওয়া (ইনটেস্টেড) উত্তরাধিকার।

হিন্দু সাকসেশান আইনে জৈন, বৌদ্ধ ও শিখদিগকেও হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান খ্রিষ্টান ও জিউজদের জন্য আছে ইন্ডিয়ান সাকসেশান অ্যাক্ট-১৯২৫ (বিশেষত ধারা ৩১ থেকে ৪৯)—পরিবারের কর্তা সম্পত্তির মালিকের পরে ছেলেমেয়েরা সমান অংশ পাবে। পার্শীদের জন্যও ওই ১৯২৫-এর আইন (বিশেষত ধারা ৫০-৫৬)। মুসলিমদের জন্য আলাদা, যদি উইল না করে মারা যায় তাহলে মুসলিম পার্সোনাল ল (শরিয়ত) অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট-১৯৩৭ প্রযোজ্য। আর যদি উইল করে মারা যায় তাহলে ইন্ডিয়ান সাকসেশান অ্যাক্ট-১৯২৫ প্রযোজ্য হবে।

আন্তধর্মীয় বিবাহিতদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বত্ব আসবে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট-১৯৫৪ অনুযায়ী।

ভারতবাসীদের মধ্যে বাকি রইল বহু সংগঠিত ও অসংগঠিত আদিবাসী পরিবারগুলির কথা, যাদের নারী-পুরুষের পারিবারিক মানমর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টা সমাজের নিজস্ব প্রথা বা পরম্পরায় প্রবহমান আজও। এদের সমাজে যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি সাধারণত নিজেদের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বন্টিত হয়ে থাকে। যেখানে পরিবারের মেয়েরা সম্পত্তির অধিকার থেকে পরিবারের পুরুষ কর্তৃক বঞ্চিত হয় সেখানে মেয়েরা উপরিউক্ত দুই-ক-১৪-তে বর্ণিত আইন ও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী সমানাধিকার পেয়ে থাকে বা আইনত তাদের অবশ্য প্রাপ্য হয়ে থাকে।

চার

নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিষয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশানুক্রমিক প্রবহমান প্রথা এবং একইসঙ্গে দেশের ও রাজ্যসমূহের বিভিন্ন বর্তমান আইনসমূহের সামগ্রিক একাত্মতা, অবশেষে এতদিনে, এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবস্থানে এল। কিন্তু বাস্তবে যে যার সমাজে, যে যার পরিবারে, এমনকী পরম্পরার অজুহাতে কিছু পুরুষ ও তাদের বশংবদ কিছু মানুষ এখনও নারী-পুরুষের অধিকারের বিভাজনটিকে সযত্নে টিঁকিয়ে রেখেছে। নারী হিতৈষী আইনসমূহকে নিজেদের কব্জায় এখনও নানান ফন্দিতে নারী বিদ্বেষী বানিয়ে রেখেছে, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীদিগকে বাধ্য করছে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে তবেই প্রাপ্য অধিকার আদায় করে নিতে। যেহেতু আইনি জটিলতা, সরকারি প্রশাসনিক মন্থরতা, ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক দুর্বলতা আর মেয়েদের আইন বিষয়ে অজ্ঞানতা এদেশে এখনও প্রবলভাবে রয়েছে, তাই এখনও মেয়েরা বঞ্চিত হয়ে চলেছে বাস্তবে—কোথাও কম, কোথাও বেশি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে।

জাতিপুঞ্জ তার ১৯৮০ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে দেখিয়েছিল, সংখ্যায় নারী-পুরুষ প্রায় সমান-সমান; সময়ের পরিমাণে নারীরা কাজ করে তিন ভাগের দু'ভাগ, আর্থিক আয় করে বিশ্বের সামগ্রিক আয়ের দশ ভাগের

এক ভাগ। আর নারী-পুরুষের মধ্যে বিশ্বের সব সম্পত্তির অংশ-মালিকানায় নারীর অংশ শতকরা এক ভাগেরও কম। পঁয়ত্রিশ বছর পরে ২০১৫-র রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে নারীদের সম্পত্তির অধিকারের মাত্রায় কিছুটা বৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু তা আশানুরূপ বৃদ্ধির হারের থেকে অনেক কম।[১] রিপোর্টে আছে, ইকোয়েডার, ঘানা এবং ভারতবর্ষের মেয়েরা জমি, বাড়িঘর, গৃহপালিত পশু এবং কৃষিজমির মালিকানা পুরুষদের থেকে প্রায়ই কম পেয়ে থাকে। অনেকগুলি পশ্চাৎপদ দেশে বংশানুক্রমিক পারিবারিক ও সামাজিক প্রথার চাপ রয়েছে এবং বিভেদমূলক আইন রয়েছে যার ফলে পরিবারের নারীরা পুরুষদের থেকে অনেক কম সম্পত্তির অধিকার পেয়ে চলেছে। এ বিষয়ে রিপোর্টটি নানান তথ্য দিয়ে দেখিয়েছে যে, ১৯৯৫ থেকে ২০১০ বিগত এই পনেরো বছরে সম্পত্তির সমানাধিকার প্রদানে এগিয়ে আসা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু তা যৎসামান্য।

ভারতবর্ষ এখন অনুন্নত নয়, উন্নয়নশীল দেশ। পরিবারের নারী-পুরুষদের সম্পত্তির সমানাধিকারের বিষয়ে বিগত প্রায় একশ (১৯২৫-২০১৮) বছরে এই দেশের আইনগত উন্নয়নশীলতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্রটি এখনও বেশ অনেকটাই পিছিয়ে। কেন পিছিয়ে এখনও, কেনই বা ১৯২৫-এর ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (যার উদ্দেশ্য ছিল সব ভারতীয়কে একই আইন সূত্রে গাঁথা) ছাড়াও আলাদাভাবে মুসলিম পার্সোনাল ল (শরিয়ত) অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট-১৯৩৭, ড. আম্বেদকারের হিন্দু কোড বিল ও এই বিলের পরিবর্ত হিসাবে অন্যান্যর সঙ্গে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন-১৯৫৬ তৈরি করতে হল। কেনই বা এই আইনের ব্যাপক সংশোধনের প্রয়োজন হল ২০০৫-এ। তবুও আইনি ব্যাখ্যায় বারে বারে হয়েছে বিভ্রান্তি—বিভিন্ন হাইকোর্টে, এমনকি সুপ্রিম কোর্টেও (২০১৫)। সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ আইনি ব্যাখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০১৮-তে যার আপাতলব্ধ হিন্দু উত্তরাধিকার আইন-১৯৫৬-র ভ্রান্তি মোচন।

কী এমন এই নারী-বিদ্বেষের ইতিহাস, যেখানে আমাদের সামাজিক সভ্যতার বয়স প্রায় চার হাজার বছর। প্রাক্-বৈদিক, প্রাক্-আর্য 'এ দেশীয় সিন্ধু সভ্যতার যুগে'[২] (*২ লাল-২০১৫) আমাদের নারী-পুরুষের অধিকারের বিষয়টা কেমন ছিল, আর পরবর্তী সুদীর্ঘ সময়ে কেমনভাবে গতিশীল হয়ে তবে বর্তমান অবস্থান লাভ করেছে তা সামনে না এলে দৃশ্যপটটা স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হবে না। এমনটা মনে করেই ইঙ্গিত দিয়েছি শুরুতে। এখন তাই আমরা ফিরে দেখব আমাদের আদি সংস্কৃতিটাকে। দেখব সেই সংস্কৃতির কোন্ জীবনীশক্তি এখনও প্রাণবন্ত করে রেখেছে পরিবারে ও সমাজে নারী-বিদ্বেষী ভাবধারনাকে। আমাদের আলোচ্য বিষয় সব অধিকারকে নিয়ে নয়, শুধুমাত্র পারিবারিক যৌথ সম্পত্তির অধিকার নিয়ে। কিন্তু যেহেতু এই বিশেষ অধিকারটি অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাই পরিবার ও সমাজের নারী হিতৈষণা ও নারী বিদ্বেষ—উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য ও দর্শনটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই, আমাদের অবশ্যই আলোচ্য।

(ক্রমশ)

'মানুষী কথা' পত্রিকা ও মানুষীর বইঘর

যোগাযোগ : ৯৪৩২২০৯৭৭০

নারীবাদ লিঙ্গভিত্তিক নয় একটি দর্শন

মানুষী কথা পত্রিকার এক বছর পূর্ত্তিতে এই আলোচনাটি হয় ১৮ অগস্ট ২০১৮। আলোচনার বক্তা হিসাবে ছিলেন অধ্যাপক শাশ্বতী ঘোষ, নন্দিতা ধাওয়ান, মেরুণা মুর্মু, গবেষক ও লেখক পার্থপ্রতিম। আলোচনায় উঠে এল নানা পক্ষপাতিত্ব, বঞ্চনা, বৈষম্যের কথা। একেক জন একেক ভাবে তুলে ধরলেন তাঁদের বক্তব্য। আলোচনায় অংশ নিলেন দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে থেকে স্বপন মুখোপাধ্যায়, অসীম ঘোষ, তাপস ঘটক, সাগরিকা দত্ত, মালা ঘোষ, নিশা বিশ্বাস এবং অন্যান্যরা।

আলোচনায় ঘোষকের ভূমিকা ছিল সুতপা দেবের। রিপোর্ট লিখেছেন জয়ন্তী ভট্টাচার্য্য। শুরুতে বক্তব্য রেখেছেন প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী। পরবর্তীকালে রিপোর্টটি প্রকাশ করা হবে।

মানুষীর বইঘরে নতুন সংগ্রহ

নারী ও সমাজ (২০০৮-২০১৬ পর্যন্ত) সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন নারী বিষয়ক সংবাদের সংকলন

পদ্মপাতায় জল

বিহার-নারী সমাজ সংগ্রাম

রামায়ণ যখন ইতিহাস

রোজালুক্সেম বার্গ

সিলেক্টেড রাইটিংস অন উইমেন'স কোয়েশ্চেন

দ্য রেডিয়াম গার্লস